তারিখ 21 OCT 2002
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

দৈনিক
ইত্তেফাক

বাংলাদেশের বিজ্ঞান শিক্ষার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অন্ধকার দূরীকরণে কিছু প্রস্তাব

মোঃ শহীদুল্লাহ্

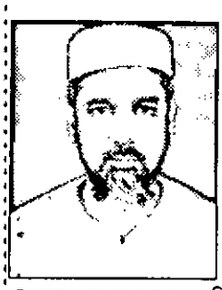

সমস্ত বিশ্বে বিজ্ঞানের জয়জয়কার চলছে। তথ্য প্রযুক্তি, যোগাযোগ, পরিবহন, ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাংকিং, হিসাব-সংরক্ষণ, চিকিৎসা, কৃষি, জিন প্রযুক্তি, শিক্ষা, সংস্কৃতি ইত্যাদিতে এমন কোন বিভাগ নেই যেখানে বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ছোঁয়া লাগেনি। বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতির বা সামগ্রীর ব্যবহার করতে হলে সে ব্যাপারে জ্ঞানার্জন জরুরী। আমাদের দেশে সে বিষয়ে জ্ঞানার্জনের পথ সীমিত। ব্যাপক প্রচারণার ফলেই হোক আর ব্যবসায়িক স্বার্থ বিবেচনায়ই হোক এদেশে কম্পিউটারের ব্যাপক প্রচলনের ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। যা অনেক ক্ষেত্রেই ক্যালাণকর আবার অনেক ক্ষেত্রেই অকল্যাণকর। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান বিভাগে প্রতিটি বিজ্ঞান বিষয়ে ব্যবহারিক ২৫ নম্বর করে রাখা হয়েছে। বিগত ৫০ বছরেও তা কার্যকরীভাবে কাজে লাগানো যায়নি। কোন বিদ্যালয় বা কলেজে ল্যাবরেটরী নেই, কোনটিতে ল্যাবরেটরী আছে যন্ত্রপাতি নেই, কোথাও আবার প্রয়োজনীয় শিক্ষক নেই, কোথাও শিক্ষক আছে মান মত ব্যবহারিক ক্লাস হয় না। আবার কোথাও সব ব্যবস্থা থাকলেও ক্লাস করার মানসিকতা নেই। ব্যবহারিক পরীক্ষার ২৫ নম্বর কোন কোন ক্ষেত্রে এমনিই পেয়ে যায়। কোথাও স্যারদের খেয়াল-খুশি বা কোথাও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কিছু অর্থের বিনিময়ে নম্বর প্রদান করা হয়। এছাড়াও আরো বহু ধরনের অনিয়ম বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে বিরাজমান। সব মিলিয়ে কার্যকরী বিজ্ঞান শিক্ষা বর্তমানে নেই। আপনি যদি কোন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়ে থাকেন তাহলে চিন্তা করে দেখুন আপনি আপনার শিক্ষার্থীদের আধুনিক বিজ্ঞানের কোন্ কোন্ ব্যবহারিক বিষয় কোন্ পর্যায়ে শিক্ষা দিচ্ছেন। আর আপনি যদি নিজে ডাক্তার কিংবা ইঞ্জিনিয়ার হন সেই ক্ষেত্রে আপনি কতটুকু আপনার অর্জিত জ্ঞানকে ব্যবহার বা প্রয়োগ করতে পেরেছেন বা পারছেন; না করতে পারলে তার অসুবিধা বা সীমাবদ্ধতা কোথায়? তার সাথে এটাও মিলিয়ে দেখা দরকার উল্লিখিত ক্ষেত্রে আর ৫টি উন্নত দেশের শিক্ষা দান পদ্ধতি কেমন। আজ চিকিৎসার জন্য ব্যাপকসংখ্যক রোগী আমাদের দেশ থেকে বিভিন্ন দেশে যাচ্ছে বিশেষ করে ভারত, সিংগাপুর, থাইল্যান্ড ইত্যাদি দেশে। আমাদের দেশের ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানে মাস্টার ডিগ্রীধারী শিক্ষিত ব্যক্তিরা বিদেশে গেলে অনেক ক্ষেত্রেই উপযুক্ত মর্যাদা পান না। তাদেরকে আবার কয়েক বছরের নতুন কোর্স করতে হয়। কারণ হিসেবে বলা যায়, ঐ সমস্ত দেশে যে ধরনের সিলেবাস অনুসরণ করা হয় বা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার শিখানো হয় আমাদের দেশের উল্লিখিত শিক্ষিত ব্যক্তিরা যেখানে অধ্যয়ন করেন তার ধারে কাছেও নেই। ফলে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া আমাদের দেশের ডাক্তারগণ অন্য দেশের ডাক্তারের হয় সাহায্যকারী (এসিস্ট্যান্ট) হন, না হয় টেকনিসিয়ান, ইঞ্জিনিয়ারগণ হয় ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারের সমপর্যায়ে, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ের বিভিন্ন শাখায় পাস করা মাস্টার ডিগ্রীধারিগণ হন কোন কোন ক্ষেত্রে ল্যাবরেটরী এসিস্ট্যান্ট। যদিও এর ব্যতিক্রমও কিছুটা লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান বিশ্ব যেখানে দ্রুত জিন প্রযুক্তি, তথা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, মাইক্রোবাইয়োলজি, ক্যামিকেল সায়েন্স, ইলেকট্রনিক্স, বায়োমেডিকেলের সর্বাধুনিক পর্যায়ে প্রবেশ করছে সেক্ষেত্রে আমরা কোথায়? তা চিন্তা করলে সত্যি যে কোন চিন্তাশীল মানুষ মুষড়ে পড়বে।

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অনেকেই ক্যামিক্যালস্-এর ব্যবহার জানে না। কোন্ রিয়েজেন্ট কোন্ যৌল বা যৌগের সাথে বিক্রিয়া করে কি ধরনের রং, স্বাদ, গন্ধ প্রদর্শন করে অনেকেই তা নিজের চোখে দেখেনি বা অনুভব করেনি; শুধু পড়েছে। আজকাল গার্মেন্টস শিল্পে রংয়ের যে ব্যবহার তা যদি আমাদের জনশক্তি আগেই ব্যবহার করতে পারত তাহলে আমাদের দেশের অবস্থা ভিন্ন হত। কোন যন্ত্র কিভাবে ধরতে হয়, ব্যবহার করতে হয় তা তারা জানেনি; পাস করার পর যদিবা কখনো কোন যন্ত্র হাত দিয়ে ধরে- দেখা যাবে যে কাঁপতে কাঁপতে তা হাত থেকে এক পর্যায়ে পড়েই গিয়েছে। একটা যন্ত্রের ব্যবহার করতে করতেই তো এক পর্যায়ে সহজ যন্ত্রের আবিভার হবে, নতুন যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবে। গ্রাম বাংলার কৃষকদের জমিতে রাসায়নিক সার ব্যবহার একটি বিরাট বিষয়; কিন্তু তারা জানে না কোন মাটি কি ধরনের রাসায়নিক উপাদানসমৃদ্ধ। অন্ততপক্ষে জানা দরকার কোন্ মাটি কি পরিমাণ এসিডিক বা অম্লীয় এবং কোন্ মাটি কি পর্যায় ক্ষারীয় বা লবণাক্ত। আজ যদি আমাদের কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র/ ছাত্রীদেরকে মাটি পরীক্ষা (Soil test)-এর সহজ উপায়গুলো শিখিয়ে দিতেন তাহলে তারা গ্রামে গ্রামে Soil test centre গড়ে তুলতে পারতো। বিনিময়ে তারা পারিশ্রমিক পেত তার পরিমাণ হতো বর্তমানে চাকরির বেতনের চেয়ে অনেক বেশী। আর কৃষকেরা কোন্ জমিতে কি পরিমাণ কোন্ সার লাগবে তা জানতে পারতো। এখনতো কৃষকেরা যে জমিতে ইউরিয়া দরকার ৩০ কেজি সেখানে দিচ্ছে ৫০ কেজি আর যে জমিতে এমপি দরকার ১০ কেজি সেখানে দিচ্ছে ৫ কেজি এভাবে একাধিক জমির উর্বরতা শক্তি হারাচ্ছে। অন্যদিকে কৃষকের কৃষি উৎপাদন খরচ বাড়ছে। উৎপাদনও কোন কোন ক্ষেত্রে কম হচ্ছে। এভাবে পশু-পালন, হাঁস-মুরগি পালন, রেশম চাষ, মৎস্য চাষ, ছাপাখানা শিল্প, মানব পুষ্টি ইত্যাদি শিল্পে বিজ্ঞান শিক্ষা ব্যাপক সহায়তা প্রদান করতে পারতো। বর্তমান প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা দিয়ে এ ধরনের সহায়তা আগামী একশ' বছরে সম্ভব হবে না মনে হয়।